প্রথম

শৌভিক কুন্ডা

বুকুরা যখন আমাদের দোতলায় ভাড়া এল তখন আমরা দু'জনেই শিশুনিকেতন, দু'জনেই ক্লাস থ্রি। বুকু মানে ফর্সা ধবধবে, একটু বোকাটে, ক'য়ে হ্রস্ব উ কাকুলি দাস। হাজার চেষ্টাতেও অন্তত ক্লাস ফাইভের আগে ওই 'হ্রস্ব উ'টির হাত থেকে বাঁচানো যায়নি বুকুকে। তার বাবা শ্রীবিমলেন্দু দাস সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন ডিভিশনাল অফিসের ডেপুটি ডিরেক্টর। বুকুর ভাষায় তিনি 'বিদাস'। না, বি-এর পর কোনও ফুলস্টপ থাকত না। কেবল নামের বানানে নয়, পড়াশোনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েই অনীহা তার। অদ্ভুত সেই মেয়ে ইতিহাস পরীক্ষার দিন অক্লেশে ভূগোলের 'নকল' নিয়ে হলে যায়। বাবা শহর ঢুঁড়ে সেরা প্রাইভেট টিউটরদের নিয়ে এলেও অঙ্ক শিখবে সে কেবল আমার কাছেই। গন্ধীপোকার গন্ধ পেয়ে ঘরভর্তি বাইরের লোকের সামনে নির্দ্বিধায় বলে বসবে, 'পেদো পোকা, পেদো পোকা'! সরমা কাকিমার অস্বস্তি ভরা প্রতিক্রিয়া, 'আঃ বুকু, কী হচ্ছে' বকুনির উত্তরে তাঁকে আরও অপ্রস্তুত করে, আরও জোর দিয়ে বুকু বলে ওঠে, 'তুমি জানো না, বাবা বলেছে, ওটা পেদো পোকা'!

আমার একটা খেলনা পিস্তল ছিল। কে যে ছবি তুলেছিল, কাকুমণি বা দাদামণি, খেয়াল নেই। তবে মনে আছে, আমাদের দোতলায় সেই পিস্তল বাগিয়ে ক্যামেরার সামনে আমি। শাটার টেপার ঠিক আগ মুহূর্তে বুকু এসে জড়িয়ে ধরল আমার হাত! তাতে এক জীবন্ত ছবি হল অবশ্য! বড়রা সে ছবির নাম দিল, 'জেমস বন্ড ও সদাসহচরী'। কে যে বন্ড, তার সহচরীই বা কে, ওই বয়সে তা জানার কথা ছিল না। তবে, এরপর থেকে বেশ কিছুদিন বুকু আমাকে 'জেমস বন্ড' নামেই ডাকত, আর আমিও ওকে 'সহচরী' নামে!

অবশ্য আমার জগতে তখনও পিস্তল, ব্যাট-বলের চেয়ে বইয়ের জায়গাটা অনেক বড়! 'বুকুদের দোতলা'য় ওঠবার সিঁড়ির একটা বাঁক আমার খুব পছন্দ ছিল। ওইখানে বসে আমি বইয়ের পাতায় চোখ বিঁধিয়ে দিতাম! শুকতারা, সন্দেশ পত্রিকা বা দেব সাহিত্য কুটীরের কোনও বই। বুকু এসে পাশে বসে পড়ত ধপ করে। তারপরই খানিকক্ষণ উশখুশ করে টানত আমার হাত বা শার্ট। বলত, 'তখন থেকে তো পড়েই যাচ্ছিস আর পড়েই যাচ্ছিস। এবার থাম না বাবা! খেলবি না?' কখনও কখনও পাত্তা না পেয়ে আমার বই বন্ধ করে দিয়ে ছুটে পালাত। কখনও বা রাগ দেখিয়ে ছুড়েই ফেলত সে বই। আমিও বুকুর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছি কখনও, চড়-চাপাটিও চালাইনি এমন নয়!

এই উভয়পক্ষীয় রাগ মারামারি অবশ্য কেবল বই পড়া কেন্দ্রিকই ছিল না। মাস্টারমশাইয়ের কাছে শাস্তি পেয়ে বা মাঠের খেলায় হেরে গিয়ে আমি যেমন বাড়ি ফিরে বাহানা খুঁজতাম বুকুর উপর দিয়ে মনের ঝাল মেটানোর, বাবা-মার বকুনিতে বা স্কুলের বন্ধুদের কাছে খোঁচা খেলে বুকুও তেমনই। একবারের কথা মনে আছে, সে রাগ আমি এই আজ পর্যন্ত প্রকাশ করিনি কারও কাছে, বুকুর কাছে তো নয়ই। দাদামণির অকালে চলে যাওয়া বন্ধু ভোম্বলদা এসেছে আমাদের বাড়িতে। ছবিটা স্পষ্ট, টকটকে রং কোঁকড়া চুলের ভোম্বলদা বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। পরনে পাজামা আর গুরু পাঞ্জাবি। বুকুকে কে যেন বলেছিল, 'ওই দেখ রাজেশ খান্না'। বোকা বুকু তাই বিশ্বাস করল। দিদার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি, তারপর বাইরের বারান্দায় গিয়ে ভোম্বলদার চেয়ারের কাছাকাছি ঘুরপাক। আমি যেন নেই-ই কোথাও! সপাটে একটা চড় কষাতে পারলে বোধহয় মনের জ্বালা মিটত আমার, পারিনি। কেন পারিনি, তখন ক্লাস ফাইভের আমিটার কাছে সে ব্যাখ্যা ছিল না!

ঝগড়া যেমন, গলাগলিও তেমনি। আমাদের সে ছোটবেলার অঘোষিত ক্যাপ্টেন সবসময়ই রতনদিদি, রত্নাবলী নন্দী, আমাদের ভিতরবাড়ির ভাড়াটে। ক্যাপ্টেনের কাছে আমাদের যুগপৎ মিনতি থাকত, যে কোনও খেলাতেই আমরা যেন একদলে থাকি। সেটা মানাও হত। তাই বাড়ির লনে ক্রিকেট বা শীতের ব্যাডমিন্টনে বুকু-আমিই পার্টনার। বুকুর সঙ্গে রতনদিদির পুতুল-বিয়েতে আমি বুকুর পক্ষের কর্তা। একবার পুতুল-বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে রতন দিদি আমাদের দু'জনেরও বিয়ে দিয়েছিল। পিকনিক, পুজোয় অথবা বাড়ির যে কোনও অনুষ্ঠানেই আমার পাশের আসনটি অবশ্যম্ভাবী ভাবেই বুকুর। এমন আনন্দে বেড়ে উঠে উঠে একসময় আমরা সেভেনেও পৌঁছে গেলাম। তার দু'বছর আগেই অবশ্য আমাদের স্কুল আলাদা হয়ে গিয়েছে। ফাইভ থেকে আমি জেলা স্কুল আর বুকু কদমতলা গার্লস। ওই সেভেনেরই এক সন্ধ্যায় খবর এল বুকুরা চলে যাবে। বিদাস বদলি হয়েছেন। খবরটাতে খুব যে কিছু বিচলিত হয়েছিলাম তা নয়। না বুকু, না আমি। স্কুল বদলানো আর শহর বদলানোর মধ্যে কতটা ফারাক, ধরতেই পারিনি বুঝি! অন্তত আমি তো বটেই।

যেদিন ওরা চলে যাবে, আমাদের বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী তার আগের রাতে আমরা সবাই একসঙ্গে খাব। মা সরমা কাকিমারা চোখের জল মুছতেই মুছতেই রান্নার জোগাড় যন্ত্র করছেন। আরও অনেক দিনেরই মতো আমি আর বুকু দোতলার খোলা ছাদে বকম বকম করছি। হঠাৎই কবে কখন ওর খেলার পুতুল ভেঙে দিয়েছিলাম এই অজুহাতে বুকু আমায় কিল ঘুঁষি মেরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে গেল। সত্যের মতো সাদা জ্যোৎস্না কেবল সাক্ষী রইল তার। পরদিন, ওরা চলে যাওয়ার বেশ কিছুটা সময় পর ওই ছাদটাতে একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে টের পেলাম কী যেন একটা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল। টের পেলাম, এভাবেই বুকুরা বড় হয়ে যায় আমাকে ক্লাস সেভেনেই ফেলে রেখে। টের পেলাম একটা অচিন রিনরিনে ব্যথা ছড়িয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতর। সেই প্রথম।

একবার পুতুল-বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে রতন দিদি আমাদের দু'জনেরও বিয়ে দিয়েছিল। পিকনিক, পুজোয় অথবা বাড়ির যে কোনও অনুষ্ঠানেই আমার পাশের আসনটি অবশ্যম্ভাবী ভাবেই বুকুর

কবিতা

গল্পে যা বলেছি দিনে, রাত্রিবেলা গাইব সুরে সুরে

নববর্ষের লেখা

সুদীপ্ত মাজি

গল্পে যা বলেছি দিনে, গানে গানে বলব
রাত্রিবেলা

যা শুনে অশ্বত্থ গাছে বসে থাকা মিশকালো
প্যাঁচা
মেঠো ইঁদুরের সব মর্মস্পর্শী গল্পগুলো
দিব্যি ভুলে যাবে

গল্পে যা বলেছি দিনে, রাত্রিবেলা গাইব
সুরে সুরে

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ভিজে উঠবে মরুক্লান্ত উট
মল্লারের মেঘমালা বেজে উঠবে হৃদিঅন্তঃপুরে...

জলের হইচই

তনুশ্রী চক্রবর্তী

হারিয়ে গেছি সন্দীপন, হারিয়ে গেছি আমি।
তোমার কাছে তোমার অহং আমার থেকেও দামি!
নুড়ি পাথর যা কুড়োলাম, আমার কাছেই থাক
শাওন আসুক মেঘের দেশে, আমার চিচিং ফাঁক।

হারিয়ে গেছি সন্দীপন, হারিয়ে গেছি আমি,
কার বিরহে কাতর তুমি, হচ্ছ অভিমানী?
হারিয়ে যাবার গল্পগুলো কোঁকড়া কালো উল
ধোঁয়ায় ঢাকা কান্না-হাসি, তারাও ছিন্নমূল।

হারিয়ে গেছে তিস্তা নদী? হারিয়ে গেছে বই?
হারিয়ে গেল কোথায় মাঝি জলের হই চই!
কী হারালি কীই বা পেলি হিসেবটুকু তোর
সন্দীপন যে বাতাহত, হারিয়েছে সে জোর!

সন্দীপনের গল্প-নটে মুড়িয়ে খেলো গরু
জয় পরাজয়ের নাছোড় না হোক, সমরক্ষেত্র কুরু!
অস্ত্রবিহীন চাঁদটা যেমন রাতের সাথে লড়ে
সবটা বোঝে তরুণ প্রেমিক, প্রলয় ঝড়ের পরে।

আবছায়া

বুবুন চট্টোপাধ্যায়

জানলার কাচে বরফের গুঁড়োর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কোন দূরে গির্জায় ঘণ্টা বাজল। আর ঘাসে ঘাসে আবছা বিটোফেন। আমার সাদা লেস দেওয়া ফ্রকের গায়ে একটা ভিনদেশি মেঘ কান্নার মতো মাঝে মাঝে চলকে উঠত। চলকে উঠত ফেলে আসা রক্তের দাগ। আমার প্রতিটি হারানো রক্তের দাগে মিশে আছে তোমার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার স্মৃতি। প্রতিটি যুদ্ধের শেষে আমাদের দেখা হওয়া মিলিয়ে যাচ্ছে গির্জার গা ঘেঁষে সেই অলৌকিক বেড়ালের চলে যাওয়ার মতো।
প্রতিটি গির্জার গায়ে আমাদের চুম্বনের দাগ।
ফাদার জানতেন মনসিজ।

সে

সৌমিত বসু

একটা উন্মাদ শহরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পৌঁছলো আমাদের গ্রামে। এখানে মানুষ প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে, এখানে জলের ভেতর থেকে শব্দ করে হেসে ওঠে সমস্ত বুদ্বুদ। পা থেকে খুলে রাখা অহংকার ছড়িয়ে রয়েছে মাটিতে। জ্যোৎস্না রাতে যাকে চিনে বাড়ি ফিরে আসা। এখন দেখার কথা সে কীভাবে মানিয়ে নেয় এই গ্রাম। সারা উঠোন দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই প্রতীক্ষায়।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক